উচ্চশিক্ষা ॥ ভিসিদের পদত্যাগ- শেষ কোথায়

ড. মিহির কুমার রায়

প্রকাশিত: ২০:৪৮, ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪; আপডেট: ২০:৪৯, ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪

ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের মুখে সরকার ক্ষমতাচ্যুত

অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদকাল যতই দীর্ঘায়িত হোক না কেন, যেহেতু এটি কোনো নির্বাচি সরকার নয়, সেহেতু শেষ পর্যন্ত একটি সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান ও নির্বাচি প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের বাধ্যবাধকতা তাদের রয়েছে। কাজেই একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

UNIBOTS

Advertisement (1 of 2): 2:05

আরও গুরুত্বপূর্ণ হলো, সেই নির্বাচনে দেশের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহ নিশ্চিত করার মতো একটি রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি। এজন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদা হলো- দেশে গণতান্ত্রিক বিধিবিধান ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করা, যা বিগত এক-দেড় দশকে একেবারে ভঙ্গুর অবস্থায় পৌঁছে গেছে। সুশাসনের অভাব, গণতন্ত্রহীনতা ও দুর্নীতি দেশে যে সামাজিক বৈষম্য সৃষ্টি করেছে, ধর্মাধর্মের বিভেদের কারণে যে ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা সৃষ্টি হয়েছে তা নিরসন ও একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য জরুরি।

এসব সংস্কার কাজ রাজনৈতিক সরকারের করার মতো পরিবেশ দেশে কবে তৈরি হবে সে বিষয়ে অনিশ্চয়তা রয়েছে। কাজেই এর যতটা করা সম্ভব অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকেই করতে হবে। সেজন্য অবশ্যই তাদের সময় প্রয়োজন। কারণ, এর সঙ্গে অর্থনীতিও জড়িত।
এই আন্দোলনের ফলে শিক্ষাখাতে (উচ্চমাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা) ধস নেমেছে, তা আগে কল্পনা করা যায়নি। উচ্চমাধ্যমিকে ৭টি বিষয়ের পরীক্ষা শেষ হওয়ার পরপরই আন্দোলন শুরু হয় এবং ছাত্রদের দাবির কারণে কর্তৃপক্ষ বাকি পরীক্ষাগুলো বাতিল করে দেয়। এতে ছাত্রদের মধ্যে এক অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়, যা এখনো কাটেনি। এখন আসা যাক উচ্চশিক্ষা বিষয়ে, যা আরও অনিশ্চিত।

ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের মুখে সরকার ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর স্বায়ত্তশাসিত ও সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে উপাচার্য (ভিসি), উপ-উপাচার্য, কোষাধ্যক্ষসহ শীর্ষ পর্যায়ে শিক্ষক কর্মকর্তারা পদত্যাগ করেছেন। তাঁরা সবাই বিগত সরকারের আমলে নিয়োগপ্রাপ্ত। এই পরিস্থিতিতে প্রায় 'অভিভাবকহীন' হয়ে পড়া এসব উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা ও প্রশাসনিক কার্যক্রম স্বাভাবিকভাবে চলছে না। নতুন নিয়োগ দেওয়া শুরু হলেও কবে সকল নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ হবে, তা সময়ই বলে দেবে।

শিক্ষাসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে এবারের সংকটের বড় কারণ দলীয়করণ। বিগত সরকারগুলোর আমলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যসহ শীর্ষস্থানীয় পদে দলীয় আনুগত্য রয়েছে এমন শিক্ষক-কর্মকর্তাদের নিয়োগ হয়েছে। এতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সব সময় দলীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে এসেছে। ক্ষমতাসীন দলগুলোর ছাত্র সংগঠনও এই সুযোগে ক্যাম্পাস ও আবাসিক হলে প্রভাব বিস্তার করে। এমন পরিস্থিতির ভুক্তভোগী হন সাধারণ শিক্ষার্থীরা।

এসব অভিজ্ঞতা বিবেচনায় রেখে গ্রহণযোগ্য শিক্ষক-কর্মকর্তাদের নিয়োগের পরামর্শ দিয়েছেন শিক্ষাসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা।

বর্তমানে দেশে ৫৫টি স্বায়ত্তশাসিত ও সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় চালু আছে। এর মধ্যে স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয় ৪টি। বাকি ৫১টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মুখে সরকার বিদায়ের পর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের হিসেবে ২৫ জন উপাচার্য, ১২ জন উপ-উপাচার্য এবং ৭ জন কোষাধ্যক্ষ পদত্যাগ করেছেন। এরই ধারাবাহিকতায় আরও দুটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদত্যাগ করেছেন।

সব মিলিয়ে ২৭টি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্যের পদত্যাগের তথ্য পাওয়া গেছে। এসব স্বায়ত্তশাসিত ও সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে (অধিভুক্ত কলেজসহ) ৪৪ লাখের মতো শিক্ষার্থী রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে 'অভিভাবকহীন' হয়ে পড়া এসব উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা ও প্রশাসনিক কার্যক্রম স্বাভাবিকভাবে চলছে না। নতুন নিয়োগও কেবল শুরু হয়েছে।

সরকার পতনের পর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা প্রশাসনকে দলীয় মুক্ত করার দাবিও তুলছেন শিক্ষার্থীরা। শিক্ষার্থীদের দাবির মুখে দেশের ১১টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, দুটি সরকারি কলেজ ও ৬টি সরকারি মেডিকেল কলেজে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এর মধ্যে ১৩টিতে শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের রাজনীতিও নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বর্তমান সংকটের বিষয়টি সচিবালয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের শিক্ষা উপদেষ্টা ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদের সংবাদ সম্মেলনেও উঠে এসেছে। তিনি সাংবাদিকদের বলেন, ৪৫টির মতো বিশ্ববিদ্যালয় এখন অভিভাবকহীন। শিক্ষাগত যোগ্যতা, ব্যক্তিত্ব, প্রশাসনিক দিক দিয়ে সবার কাছে, বিশেষ করে শিক্ষার্থীদের কাছে গ্রহণযোগ্য শিক্ষকদের তালিকা তৈরি

করা হচ্ছে। এরপর যত দ্রুত সম্ভব অন্তত প্রধান প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ দেওয়া হবে শিক্ষার্থীরা দলীয়ভিত্তিক প্রশাসন চান না বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

বর্তমানে ৫১টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় চালুর মধ্যে অন্তত ২৫টি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হয়েছে আওয়ামী লীগ সরকারের বিগত তিন মেয়াদে। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগে কোনো প্যানেল নির্বাচন হয় না। সরকারের প্রস্তাব অনুযায়ী উপাচার্য নিয়োগ দেন রাষ্ট্রপতি অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার সময় নিয়োগ, জমি অধিগ্রহণসহ নানা বিষয়ে অনিয়মে অভিযোগ রয়েছে।

কিছু কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্যদের আত্মীয়স্বজনের নিয়োগ নিয়েও নানা অনিয়ম হয়েছে এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মান নিয়েও প্রশ্ন আছে। বিদ্যমান পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যাল প্রশাসনসহ উচ্চশিক্ষায় নানামুখী সংস্কারের প্রত্যাশা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। সম্প্রতি ঢাকায় 'কেমন বিশ্ববিদ্যালয় চাই? বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কার ভাবনা' শীর্ষক এক আলোচনা আয়োজন করেছিল বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্ক নামে শিক্ষকদের একটি মোর্চা।

ওই আলোচনায় উঠে আসে সব স্তরে দলীয় আধিপত্য বিস্তারের রাজনীতি বন্ধ করতে হবে সরকারকে উদার হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়কে নিজের মতো চলতে দিতে হবে। প্রশাসনের পদে থাব শিক্ষকদের সমিতির নির্বাচনে যাওয়া যাবে না। সিদ্ধান্ত গ্রহণের সব ক্ষমতা উপাচার্যের হাতে ন রাখার প্রস্তাবও করা হয়। সব বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য একটি অভিন্ন পদ্ধতি ঠিক করে গণতান্ত্রিক উপায়ে উপাচার্য নিয়োগ দিতে হবে।

এখানে সরকারের সরাসরি হস্তক্ষেপ থাকবে না। যেখানে শিক্ষকরা ক্লাস-গবেষণাগারে সম পার করার কথা, তাঁরা সেটা না করে রাজনৈতিক দলীয় স্লোগানে নিজেদের সময় ব্য করছেন। ফলশ্রুতিতে দলীয় প্রভাবে পদোন্নতির দেখা যেমন মিলছে, তেমনি সাধার শিক্ষার্থীদের সঙ্গে দূরত্ব তৈরি হয়েছে। যা এবার ছাত্র বিক্ষোভের সময় আমরা দেখেছি।

দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আচার্য রাষ্ট্রপতি বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা আইনের প্রধান হওয়া এ উদ্যোগটি তাঁকেই নিতে হবে। বিশেষ ক্ষমতাবলে দ্রুততম সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের রাজনীতিবিদের আধিপত্য বন্ধে ক্যাম্পাস রাজনীতিতে নিষেধাজ্ঞা জারি তিনিই করতে পারেন। যাতে ভবিষ্যতে কোনো রাজনৈতিক দল বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে রাজনীতি ফেরাতে না পারে।

সেটি বন্ধ হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত কাঠামো অনুসারে যদি উপাচার্যরা ক্ষমতায় আসেন তাহলে তাঁদের আর দলদাসের কোনো সুযোগ থাকবে না। রাজনৈতিক প্রভাব খাটানোরও কোনো সুযোগ থাকবে না। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় রাষ্ট্রপতি সর্বক্ষমতার অধিকারী হওয়ায় তিনি প্রয়োজনে সব রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলোচনা করে এই কাজটি করতে পারেন। বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থীরা নতুন সরকারের কাছে এ দাবিটি তুলে দিয়ে নিজেরা সক্রিয় থেকে

ছাত্ররাজনীতি বন্ধ করে দিতে পারে। অরাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে কেবল ‘ছাত্র সংসদ সচল থাকতে পারে, যেখানে কোনো প্রার্থীর রাজনৈতিক পরিচয় থাকবে না।

আর রাজনৈতিক পরিচয় থাকলে সে ভোটাধিকার বা প্রার্থী হতে পারবে না। শিক্ষক সমিতি থাকার প্রয়োজনীয়তাও নেই। কারণ, বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট ও অধ্যাদেশ সক্রিয় থাকলে প্রচলিত নিয়মে শিক্ষকদের পদ-পদোন্নতিতে বাধা হওয়ার সুযোগ নেই। একজন শিক্ষকের প্রধান কাজ হলো শ্রেণিতে পাঠদান ও গবেষণাগারে গবেষণা করা।

এ সুযোগটি সরকারকেই করে দিতে হবে। এ দাবিটি রাজনৈতিক বিদ্বেষ থেকে নয়, বরং হাজার হাজার শিক্ষার্থী মনেপ্রাণে বিশ্ববিদ্যালয়কে রাজনীতিমুক্ত করতে চায়। তাই শিক্ষা মানোন্নয়নের স্বার্থে দেশের সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে স্থায়ীভাবে রাজনীতি বন্ধ করা বাঞ্ছনীয়।
এরই মধ্যে কিছু কিছু প্রতিষ্ঠানে ক্লাস শুরু করলেও সাম্প্রতিক বন্যার কারণে তা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। আশা করা যায়, বর্তমান সরকারের বিশেষত শিক্ষা উপদেষ্টা বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দেবেন এবং ছাত্রদের উচ্চশিক্ষার পথকে যথাশীঘ্র প্রশস্ত করবেন।

লেখক : গবেষক ও শিক্ষক